RAY: International Journal of Multidisciplinary Studies, E-ISSN: 2456-3064
Volume II, No. 2, October, 2017, pp. 44-55.

ভারতীয় সমাজ ও পতিতার ক্রমবিকাশ

Sukhendu Biswas
Assistant Professor,
Department of Bengali,
Ranaghat College, India.
sukhendu2273@rediffmail.com

কথাবস্তুর কাঠামো (Structure Abstract):

উদ্দেশ্য (Purpose): পৃথিবীর প্রাচীন একটি বৃত্তি পতিতাবৃত্তি নিয়ে আমাদের ইতিহাস চিরকাল নীরব থেকেছে। সর্বকালে সমাজের সর্বস্তরে এদের যে প্রভাব পড়েছে এবং তাদের সমস্যাগুলির সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষনের পাশাপাশি এদের জন্য উনিশ শতকে ব্রিটিশ সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছিল, তাকে সামনে রেখে পতিতাদের সমাজের মূল স্রোতে নিয়ে আসার পথের সন্ধান।

পদ্ধতি / প্রকরণ (Methodology): নির্ধারিত বিষয়টির স্বরূপ উৎঘাটনের জন্য বিভিন্ন রিপোর্ট, পুস্তক, সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন খবর বা প্রবন্ধ থেকে তথ্য আহরণ করা হয়েছে। প্রাচীন ভারত থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতীয় সংস্কৃতিতে পতিতাদের অবস্থান সম্পর্কিত কিছু আলোচনা এর সংগে যুক্ত করা হয়েছে সামগ্রিক

উপপদ (Findings): উনিশ শতকে ব্রিটিশ সরকারই প্রথম পতিতাদের জন্য একটি আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু তারপর থেকে প্রায় দুশো বছর সরকারীভাবে আর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এই উদাসীনতায় একদিকে পতিতাদের জীবন ঘৃণ্য পশুর মতো হয়েছে, তাদের সামাজিক সুরক্ষা দেওয়া যায়নি। অপরদিকে এই গোপনীয়তার কারণে সামাজিক অবক্ষয়কে রোধ করাও সম্ভব হয়নি।

মৌলিকতা / মূল্য (Originality): সময়ের সংগে সংগে সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিক্ষা সর্বক্ষেত্র উন্নত থেকে উন্নততর হয়েছে। শুধু পতিতাদের প্রতি সরকারী বা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পরিবর্তন আজও হয়নি। সুতরাং তাদের জীবনযাত্রা এবং সামাজিক অবক্ষয়ের বিষয়টির এটি একটি সমাজতাত্ত্বিক মূল্যায়ন।

Type of Paper: বিশ্লেষণমূলক (**Analytical**)

মূল শব্দগুচ্ছ (Keywords): পতিতাবৃত্তি, Indian Contigeous Deseases Act (1868), সমনাগরিক, বেশ্যা গাইড, সংক্রামক রোগ।

মুখবন্ধ (Introduction):

সর্বকালেই দেহব্যবসাকে জগতের প্রাচীনতম পেশা বলে উল্লেখ করা হয়। প্রাচীনভারতে এরা গণিকা, বেশ্যা, বারস্ত্রী, পুংশ্চলী ইত্যাদি নানা নামে অভিহিতা হতেন। নিজের পেশা গ্রহণের জন্য এদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। এ যুগের চিকিৎসা বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, কলাবিদ্যার মতো সেকালে গণিকাবিদ্যাও ছিল শিক্ষণীয় দিক। এজন্য পৃথক বিদ্যালয়ও ছিল। নৃত্য-গীতবিদ্যা ছাড়াও অভিনয়, চিত্রকলা, জ্যোতিষশাস্ত্র, ভাষাবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী হতে হত। এ প্রসঙ্গে বাৎসায়নের কামশাস্ত্রে বলা হয়েছে --

অভির ভূষিতা বেশ্যা শীলরূপগুণান্বিতা।

লভতে গণিকাশব্দং স্থানঞ্চ জনসংসদি।।

অর্থাৎ এই সকল বিদ্যায় সুশিক্ষিতা রূপবতী গুণবতী বেশ্যা গণিকা নামে অভিহিত হয়ে থাকে এবং জনসমাজে মর্যাদা প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধ সাহিত্যে অম্বপালী, মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনা এমনই দুই গুণবতী গণিকা। আর সমাজে গণিকার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার অনেক উদাহরণ রয়েছে প্রাচীন ভারতে। কথা সরিৎ সাগরে উল্লেখ আছে যে, মদনমালা নামের গণিকাকে পাটালিপুত্রের রাজা বিক্রমাদিত্য ভালোবাসতেন। রাজতরঙ্গিনীতে আছে, কাশ্মীরের রাজা জয়াপীড় কমলা নামের এক মন্দির বেশ্যাকে বিবাহ করেছিলেন। ওড়িষার রাজা কর্ণ (১২ শতক) কর্পূরশ্রী নামের এক বৌদ্ধ মন্দিরের দেবদাসীকে মহিষী করেছিলেন। প্রসিদ্ধ গণিকা অম্বপালী ছিলেন রাজা বিম্বিসারের প্রেমিকা।

এছাড়া আর একটা ঐতিহ্য ছড়িয়ে আছে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতিতে, সটা হল, ধর্মীয় ঐতিহ্য। মন্দির ভিত্তিক দেহব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই ধর্মীয় ঐতিহ্য। প্রথমদিকে দেবদাসীরা কুমারী হতেন ও চিরকৌমার্যের ব্রত গ্রহণ করতেন। পরবর্তী সময়ে রাজা তাদের দায়িত্ব নেন এবং তারা রাজার রক্ষিতা হিসাবে যুক্ত হয়। মুতল যুগে হিন্দু রাজত্বের অবসান হলে দেবদাসীরা রাজ অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়। এদিকে বিবাহেরও কোনো সম্ভাবনা না থাকায় এরা দেহব্যবসাকেই জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে। এই প্রথা আজকের সমাজেও বিদ্যমান। ১৯৮১ সালে কর্নাটক সরকারও ১৯৮৭ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার দেবদাসী ব্যবস্থাকে বেআইনী ঘোষণা করেছে। মহারাষ্ট্র সরকারও সে রাজ্যে দেবদাসী প্রথার প্রচলন নেই বলে ঘোষণা করেছে। এরপরেও এই প্রথা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। তেলেঙ্গনা অঞ্চলে এবং অন্ধ্রপ্রদেশের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে এই প্রথা বজায় আছে। আর একধরণের জাতিভিত্তিক দেহজীবিকার প্রচলন ভারতবর্ষে রয়েছে। মধ্যপ্রদেশের বানজারা ও বেদিয়া জাতির পরিবারে নিজের কন্যাদের এই পেশায় নিজেরাই নিয়ে আসে। কন্যা ঋতুমতী হলে পরিবারে নানা আনন্দ অনুষ্ঠান করা হয় খুশিতে। কারণ কন্যা দেহজীবিকা গ্রহণের উপযুক্ত হয়েছে বলে। অর্থাৎ বেশ্যাবৃত্তি এখানে পরিবারের জীবিকা হিসাবে সুনজরে দেখা হচ্ছে।

প্রাচীনকাল থেকে এই সকল সুশিক্ষিত পরিবারের উপার্জনকারী সম্মানীয় সদস্যা হিসাবে বেশ্যারা থাকলেও এর পাশাপাশি সাধারণ পথচারী গণিকারও ছিল এবং এখনো আছে। যাবতীয় অসম্মান এরাই সহ্য করেছে। আজকের দিনের যৌনকর্মীদের মতো সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাবই এদের এই পেশায় নিয়ে এসেছে। এইসকল পথচারী যৌনকর্মীরা সামাজিক ও সাংসারিক জীবনে অমানবিক লাঞ্ছনা অপমান নীরবে সহ্য করে এসেছে। বাধ্য হলেও বেশ্যালয়গুলোতে এসে তারা যেমন আর্থিকভাবে সাবলম্বী হতে চাইল তেমনি প্রথম একটু স্বাধীনতার স্বাদ পেল। মৌ ভট্টাচার্য তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ 'বেশ্যাপাড়ার পাঁচটি দুর্লভ সংগ্রহ' - এ মন্তব্য করেছেন - *''খেতে না পাওয়া মেয়েদের এই বৃত্তিটা এবং বেশ্যালয়গুলো হয়ে গিয়েছিল নিজস্ব স্পেস, যেখানে সে প্রাণখুলে গালি দিতে পারে, নিজের রোজগার করা অর্থে ইচ্ছেমতো খরচ করতে পারে। ...গোটা উনিশ শতক জুড়ে ভদ্রবাড়ির মেয়েরা চাকরি করতে যাচ্ছেন এমন চিত্র বিশেষ নেই। অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার হয়তো প্রথম চিত্র এই বেশ্যাদের রোজগারের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। তা সে যত অনাচার, অত্যাচার, লাঞ্ছনার মধ্যে দিয়েই হোক না কেন।''* কিন্তু যেটা তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, সেটা হল, অনিয়ন্ত্রিত ও অসংরক্ষিত মিলন। যার ফলে নানা কঠিন রোগ বাসা বাঁধছে এইসকল বেশ্যাদের দেহে। আর তা থেকে সমাজের সর্বস্তরে তা ছড়িয়ে পড়ছে। আসলে আমরা সামাজিক মর্যাদার দিকটিকেই চিরকাল দেখে এসেছি, এর দৈহিক অবক্ষয়ের দিকটিকে জেনেও অবহেলা করে এসেছি। আর আমাদের শিক্ষিত সমাজ 'ইমেজ' হারানোর ভয়ে সব জেনে বুঝেও বেশ্যাদের নিয়ে আলোচনায় অংশ নিতে কখনো আগ্রহ প্রকাশ করেনি। অথচ এই দায়িত্বটা পালন করার কথা শিক্ষিত সমাজেরই।

উনিশ শতকে বঙ্গদেশে প্রথম বেশ্যাদের নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হয় এবং সেই সূচনাটা করে ব্রিটিশ সরকার। বেশ্যালয়ে গমনের প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় ব্রিটিশ সেনাবাহিনী নানা সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে থাকে। ফলে ১৮৬৪ সালে 'ক্যান্টনমেন্ট অ্যাক্ট' (Act XXII of 1864) নামে আইন চালু করেন। এরপর যখন দেখা গেল শুধু সেনাবাহিনী নয়, সমাজের সর্বস্তরে এ রোগ ছড়িয়ে পড়ছে তখন একপ্রকার বাধ্য হয়েই 'Indian Contigious Act, XIV of 1868' নামে একটি কঠিন আইন প্রণয়ন করে। সেই সময় বেশ্যাদের জন্য এই আইনের সপক্ষে-বিপক্ষে সমাজের সর্বস্তরে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে আলোচনার ঝড় ওঠে। কিন্তু যে বিষয়টি বিশেষভাবে খেয়াল করবার, সেটি হল, এতদিন পর্যন্ত প্রকাশ্যে যে আলোচনা করতে মানুষের অনীহা ছিল, আজ সে আলোচনা প্রকাশ্যে চলে এল। যার ফলে বেশ্যাদের প্রসঙ্গে সাধারণ মানুষের ভাবনার মধ্যে কয়েকটি বিষয় এসে গেল।

১) ভারতীয় ঐতিহ্যে সমাজে বেশ্যাদের অবস্থান এবং সমাজে তাদের পেশাগত মর্যাদা।

২) বেশ্যাদের পেশার বিষয়টিকে সরকারীভাবে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিচার করা।

৩) আজকের দিনে দেহব্যবসার বিষয়টির পর্যালোচনা এবং ব্রিটিশের চৌদ্দ আইন থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকারীভাবে একটি সুনির্দিষ্ট নীতি প্রনয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা।

৪) ঘৃণা নয় মানবিক দৃষ্টিতে বিষয়টিকে বিচার করা।

এরপর প্রায় দুশো বছর কেটে গেছে। কিন্তু এই বিষয়টি আর আলোচিত হয়নি এবং সরকারীভাবেও আর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এমনকি স্বাধীনতার সত্তর বছর পরেও হয়নি। পতিতাবৃত্তি যেহেতু পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া কখনোই সম্ভব নয়, সেজন্য সেটি যাতে নিয়ন্ত্রিত ও সুরক্ষিকতভাবে হয়, এবং পতিতাদের যাতে সুস্থস্বাভাবিক একটি জীবন দান করা যায়, সেই বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিকোণ থেকে এর বিচার-বিশ্লেষণ এবং একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরী করা বিশেষ প্রয়োজন।

পূর্ববত গ্রন্থ পর্যালোচনা (Lilerature Review):

ভারতের বারাঙ্গনা বা পতিতাদের বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সেখানে বারাঙ্গনাদের জীবনেতিহাস ও তাদের সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে রচিত বহু গ্রন্থের মধ্যে নির্বাচিত কয়েকটি গ্রন্থের আলোচনা নিচে করা হল।

চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৮), প্রাচীন ভারতে বারাঙ্গনার উৎপত্তি এবং তাদের সামাজিক সম্মান প্রতিষ্ঠা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যের যুগের সূচনা থেকেই বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণের পূর্বে নানাবিদ্যায় পারদর্শী হতে হত এবং তার জন্য পৃথক বিদ্যালয়ও ছিল। এসবের মধ্যে কোনো গোপনীয়তা ছিল না। এমনকি বেশ্যারা তাদের আয়ের একটা অংশ কর হিসাবে রাজাকে দিত। সুতরাং ভারতবর্ষে বেশ্যাবৃত্তির একটি সামগ্রিক ইতিহাস পর্যালোচনা করছেন লেখক।

মানদা দেবী (১৯২৯), লেখিকা নিজে একজন পতিতা। গ্রন্থখানি মূলত তাঁর আত্মচরিত। বাল্যকাল থেকে কৈশোর পেরিয়ে কীভাবে তিনি পতিতা হলেন প্রথম পর্বে তার বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু মূল গ্রন্থ এর পরবর্তী ‘পলায়ন’ পর্ব থেকে। কারণ এরপর আমরা পাই একজন শিক্ষিত পতিতার মুখে তার নিজের অভিজ্ঞতার কথা, যা ইতিহাসে বিরল। এ পর্যন্ত আমরা পতিতাদের যত বিবরণ পেয়েছি সবই অন্যের চোখে দেখা, অন্যের অনুভূতির বর্ণনা। কিন্তু এমন একটি নির্ভেজাল পতিতার ‘আত্মচরিত’ এর আগে পাইনি। সেই অর্থে এই দুর্লভ আত্মচরিত পতিতাদের জীবন সম্পর্কে আমাদের অনেক দুয়ার খুলে দিয়েছে।

ভট্টাচার্য (২০১১), উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় ব্রিটিশ সরকার বেশ্যাদের জন্য যে আইন প্রণয়ন করেছিল, তার কারণ ও ফলশ্রুতি এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই বিষয়ে যে আলোচনার উল্লেখ করা হয়েছে। তা থেকে সেই সময় বাঙালি সমাজ পতিতা বিষয়ে কী মানসিকতা পোষণ করত তারও পরিচয় আমরা পাই। কিন্তু মূলত গ্রন্থটি একটি সম্পাদিত গ্রন্থ। উনিশ শতকে সরকার দ্বারা

প্রণীত আইনটির বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ 'বেশ্যা গাইড' প্রকাশ ও সেই সম্পর্কের আলোচনা। যে কারণে আজকের দিনে বেশ্যাদের বিষয়ে সরকারী নীতি নির্ধারণে গ্রন্থটি সহায়ক হবে বলে মনে হয়।

সুর (২০১৪), গ্রন্থটি মূলত ভারতে বিবাহ প্রথা প্রচলন এবং তার ধারাবাহিক বিষয়ে লেখা। কিন্তু তার মধ্যে তিনটি অধ্যায় (বিবাহ-পূর্ব যৌন সংসর্গ, বিবাহ বহির্ভূত যৌন সংসর্গ, হিন্দু সমাজে গণিকার স্থান) পতিতা বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। এই অধ্যায় থেকে আমরা স্বতন্ত্র যে বিষয়টি জানতে পারি, সেটি হল, আদিবাসী সমাজে পতিতা সম্পর্কে তাদের ধারণা। এছাড়া বাংলা ছাড়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশে পতিতা বৃত্তি এবং সমাজে তাদের অবস্থান বিষয়ে একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে।

পূর্বোক্ত আলোচনার সীমাবদ্ধতা (Gap in Existing Literature):

পূর্ববর্তী লেখকগণ ভারতে বারাঙ্গনাদের জীবনযাপন, তাদের সামাজিক অবস্থান এবং সামাজিক অবক্ষয়ের দিকটি বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন, কিন্তু এর বাইরে আরও কিছু দিক নিয়ে গবেষণার অবকাশ রয়ে গেছে, বিশ্লেষণের মাধ্যমে যেগুলোর উন্মোচন ঘটানো প্রয়োজন। সেই অনালোচিত দিকগুলি হল --

১) দেখা গেছে যে, অধিকাংশ লেখক পতিতাদের জীবনযাপন এবং তাদের প্রতি সমাজের যে ঘৃণ্য অমানবিক একটি দৃষ্টভঙ্গী রয়েছে, সেদিকেই আলোকপাত করেছেন। অনেকক্ষেত্রে পতিতাদের সমাজ কলুষিত করার জন্য কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। কিন্তু এই সকল পতিতাগণও যে মানুষ, তাদেরও যে আর পাঁচটা মেয়ের মতো স্বাভাবিক জীবনযাপনের অধিকার আছে, স্বপ্ন আছে, সে বিষয়টি পূর্বোক্ত লেখকগণের আলোচনায় প্রাধান্য পায়নি।

২) পতিতাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সরকারী ও বেসরকারী সকল স্তরে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। তা না হলে, পতিতাদের শরীরে জমে ওঠা মারণ রোগ উপোভোক্তাদের মাধ্যমে সমাজে ছড়িয়ে পড়ে, সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে; সেই বিষয়টিকে কেউ গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেননি। তারা কেবল পতিতাবৃত্তি নিবারণের দিকে নজর দিয়েছেন। কিন্তু এই বৃত্তি যে আদিম বৃত্তি; শত চেষ্টাতেও এ বৃত্তি রোধ করা যায় না; সেই বিষয়টি তাঁরা বোঝার চেষ্টা করেননি।

৩) পতিতাদের অপরাধী হিসাবে দেখার দৃষ্টি থেকে তাদের বহুদূরে সরিয়ে দেবার যে চেষ্টা, তা কোনো সমাধান এনে দিতে পারে না। কারণ যা যতটা নিষিদ্ধ থাকবে তার প্রতি আগ্রহ ততই বৃদ্ধি পাবে, এটাই মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। কিন্তু পতিতাদের স্বাভাবিক জীবনমুখী করে তোলার জন্য সরকারীভাবে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ, তার কোনো রূপরেখা পূর্বোক্ত লেখকগণের লেখায় পাওয়া যায়নি।

৪) শুধুমাত্র একজন লেখকই উনিশ শতকে ব্রিটিশ সরকারের পতিতাদের বিষয়ে করা আইন 'Indian Contagious Deseases Act (1868)' সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিন্তু বর্তমানের প্রেক্ষিতে তার প্রয়োজনীয়তা কোথায় বা এই জাতীয় আইনের প্রয়োগ করার বিষয়ে বিশদে কোনো আলোচনা নেই। অথচ ব্রিটিশের এই আইনটিই পতিতাদের স্বাস্থ্য বিষয়ে তৈরী হওয়া প্রথম সরকারি পদক্ষেপ। এর থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমানের পদক্ষেপগুলো কেমন হবে তা নির্ধারণ করা যায়।

গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the Study):

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হল -- প্রথমত, ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যে বারাঙ্গনা বা পতিতাবৃত্তি কেমন ছিল এবং বর্তমানের প্রেক্ষাপটে তাদের অবস্থান কেমন আছে সে বিষয়ে সম্যক ধারণা গড়ে তোলা।

দ্বিতীয়ত, পতিতাবৃত্তি একটি সমান্তরাল সামাজিক প্রথা। একে অস্বীকার করে চোখ বন্ধ করে থাকার মতো বোকামি বা ক্ষতিকর প্রবণতা আর হতে পারে না। প্রচলিত এই অবহেলার দৃষ্টিকোণকে সচেতন দৃষ্টিকোণে মানুষের চিন্তাধারাকে চালিত করা।

তৃতীয়ত, শুধুমাত্র ঘৃণা পোষণ করে পতিতাবৃত্তির মতো প্রথাকে বন্ধ করা যে যায় না, সে বিষয়টিকে বোঝানোর চেষ্টা করা।

চতুর্থত, পতিতাদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনমূখী করে তোলার জন্য কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ সম্পর্কে সচেতন করা।

পঞ্চমত, শুধু আইন করে পতিতাদের মঙ্গলসাধন সম্ভব নয়, সেই আইনের প্রয়োগে যে আন্তরিকতা ও মানবিক দৃষ্টিকোণ প্রয়োজন; নাহলে সকল আইনই যে ব্যর্থ হবে উনিশ শতকের ব্রিটিশে চৌদ্দ আইনের প্রয়োগের ব্যর্থতা থেকে তা বোঝানোর চেষ্টা করা।

পদ্ধতি / প্রকরণ (Methodology):

এই গবেষণাটি আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় একটি 'Qualitative Research' এবং এর প্রকৃতি হল বিশ্লেষণমূলক।

তথ্যসংগ্রহ (Data Collection):

১. প্রথম স্তরে বিভিন্ন পুস্তক, রিপোর্ট, সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর ইত্যাদি থেকে বিষয়টির স্বরূপ উৎঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে।

২. প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত পতিতাদের মর্যাদা বিষয়ে সমাজ বা রাষ্ট্র কতটা আগ্রহ বা অনীহা রয়েছে, সে সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর এবং সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার রিপোর্ট থেকে জানার চেষ্টা করা হয়েছে যাতে এই বিষয়ে সমাজ বা রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গী প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হয়।

৩. এছাড়া এর আগে পতিতাদের বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কিনা সেটা জানার চেষ্টা করা হয়েছে; যাতে তার সাফল্য-ব্যর্থতার বিশ্লেষণ করে বর্তমানের পদক্ষেপগুলো নির্ধারণ করা যায়।

আলোচনা (Discussion):

প্রাচীনকাল থেকেই বারাঙ্গনাগণ দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে সমাজে বিরাজ করেছে। একটি ধারা রাজ অনুগ্রহে বা রাজা নিয়ন্ত্রিত। অন্য ধারাটি অনিয়ন্ত্রিত অন্ধগলিতে প্রবাহিত। প্রথম ধারাটি ছিল অভিজাত সমাজের মনোরঞ্জনের জন্য। আর অপর ধারাটি সর্বসাধারণের প্রবৃত্তি চরিতার্থতার সস্তা ও সহজ পথ। এই দুই ধারার বারাঙ্গনাগণ আজও সমাজে বিদ্যমান। সমাজ এতদিন এইসব বারাঙ্গনাদের সামাজিক ব্যাধি হিসাবেই দেখে এসেছে। কিন্তু এরা যে তাদের নিজেদের ও অন্যের দেহে নানাবিধ ব্যাধির জন্ম ও সংক্রমণ করে চলেছে এ বিষয়ে সমাজ কখনো ভাবেনি। সেই ভাবনা প্রথম এলো উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ সরকারের তরফে গঠিত আইনের মাধ্যমে। ব্রিটিশ সৈন্যদের মধ্যে যৌন রোগের প্রবণতা বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধানের জন্য ১৮২৭ সালে একটি সার্ভে করা হয়। সার্ভে রিপোর্টে সেনাবাহিনীর মধ্যে সংক্রামক রোগের বৃদ্ধির শতকরা হারটি ছিল এইরকম --

সাল	শতকরা হার
১৮২৭	২৯ শতাংশ
১৮২৯	৩১ শতাংশ
১৮৬০	৭০ শতাংশ

ফলে সরকার ১৮৬৪ সালে সেনাবাহিনীর জন্য 'ক্যান্টনমেন্ট অ্যাক্ট' (Act XXII, of 1864) এবং বেশ্যাদের সুরক্ষার জন্য 'Indian Contigeous Deseases Act (1868)' চালু করেন। যদিও সে আইন সরকার করেছিল সম্পূর্ণ নিজেদের স্বার্থে। কিন্তু বারাঙ্গনাদের নিয়ন্ত্রণ ও তাদের দেহে বাসা বাঁধা রোগ বিষয়ে সরকারের সচেতনতা প্রশংসার দাবী রাখে। কিন্তু তার প্রয়োগ ঘটেছিল ভয়াবহরূপে। যা নিয়ে তৎকালীন সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। একদিকে এই আইনের সমর্থনে পত্র-পত্রিকাগুলি গলা ফাটাতে থাকে; অন্যদিকে এর প্রয়োগের নিষ্ঠুরতা ও ভয়াবহতা বিষয়ে চলে প্রতিবাদ। অথচ এর থেকে আমাদের ইতিহাস অন্ধকারের যাত্রী এই সকল অসহায় বারাঙ্গনাদের নিয়ে আলোচনা করতে কখনোই আগ্রহ দেখায়নি।

কিন্তু আজও যদি আমরা সে ইতিহাসকে তুলে না আনি তাহলে বর্তমান পরজন্মকে সচেতন ও নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা আমরা আর কখনোই দিতে পারব না।

বেশ্যাদের বিষয়ে প্রকাশ্য আলোচনায় শিক্ষিত সমাজের এই অনীহার মূলে আর একটি কারণ হল, দীর্ঘকাল ধরে এদের প্রতি একটি ঘৃণা পোষণের মানসিকতা। অন্তরে আগ্রহ থাকলেও প্রকাশ্য আলোচনায় আমরা দ্বিধাগ্রস্ত। আমরা ভেজাল ওষুদের কারবারীকেও শিল্পপতির মর্যাদা দিতে পারি। অথচ পেটের দায়ে পথে দাঁড়ানো মেয়েকে ন্যূনতম মানুষ বলে ভাবতে পারি না। এ প্রসঙ্গে একটি ভবিষ্যৎবাণী করে রাখা ভালো। আগামীদিনে এই দেহব্যবসা শিল্প-বাণিজ্যের পর্যায়ে চলে যাবে। সে আমরা মেনে নিতে পারি বা না পারি। কোনো অবস্থাতেই এই পরিণতিকে আটকানো সম্ভব নয়। আসলে আমাদের দেশে নগরায়ণের ফলে নতুন অর্থনীতির উদভব ঘটেছিল। শিল্পকেন্দ্রিক এই অর্থনীতি ও সামাজিক অবস্থায় গ্রাম সমাজ ও পরিবারচ্যুত মানুষ যে বিনোদনের আশায় বেশ্যাদের কাছে যাবেন, এটাই আধুনিকতার অবধারিত পরিণতি। একটু আগে দেহব্যবসার বাণিজ্যের যে কথাটা বলা হল, তার আভাস পাওয়া গেল ২০১২ সালের ৪ নভেম্বরে আনন্দবাজার রবিবাসরীয়-র একটি আলোচনা। চমকে দেওয়ার মতো খবর ছিল সেখানে। ব্রাজিলের মেয়ে ক্যাটরিনা ও রাশিয়ার ছেলে অ্যালেক্স স্টেপানভ অস্ট্রেলিয়ার এক ফিল্ম কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয় এই মর্মে যে, তাদের কৌমার্য নিলামে তোলা হবে। যে বেশি দাম দেবে সে পাবে কৌমার্য হরণের অর্থাৎ সঙ্গমের অধিকার। ক্যাটরিনার কুমারিত্বের দাম ওঠে ৭৮০০০০ মার্কিন ডলার। জাপানের একটি ছেলে এই দামে কিনে নেয় ক্যাটরিনার কৌমার্য। আর অ্যালেক্স স্তেপানভের কৌমার্য বিক্রি হয় ৩০০০ মার্কিন ডলারে। ব্রাজিলের মেয়ে নেনে বি কিনেছেন তার কৌমার্য। ২০১৭ সালের ৯ এপ্রিল সংবাদ প্রতিদিনে আবার পাওয়া গেল আর একটি খবর। ১৮ বছর বয়সী রোমের মডেল আলেকজান্দ্রা কেফ্রেন ১৭ কোটি টাকা দামে মিস্তারেলা এসকর্ট নামে একটি জার্মান অনলাইন সংস্থায় বিক্রি করে দেন তার কৌমার্য, কিনে নেন হংকং-এর এক ব্যবসায়ী। সুতরাং যা অবশ্যম্ভাবী তার জন্য শুধু হায় হায় বা গেল গেল রব না তুলে তা যাতে নিয়ন্ত্রিত সুরক্ষিত ও সরকারী বৈধতা নিয়ে হাজির হয় তার দিকে নজর দেওয়া উচিৎ।

নিজেদের স্বার্থে শুরু করলেও এই দায়িত্ব পালনের প্রথম প্রয়াস শুরু করেছিলেন উনিশ শতকের বাংলার লেফটেনেন্ট গভর্নর। 'Indian Contigeous Deseases Act (1868)' যতই সমালোচিত হোক না কেন এর উদ্দেশ্য বিষয়ে কারো কোনো নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। এই আইন ব্যর্থ হবার মূলে রয়েছে এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও বেশ্যাদের প্রতি পাশবিক আচরণ। কিন্তু এই আইনটি আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে, দেহব্যবসা সরকারি নিয়ন্ত্রণে একটি সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিতভাবে চললে অবক্ষয়ের হাত থেকে সমাজকে বাঁচানো সম্ভব এবং সেই সঙ্গে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত মেয়েদের স্বাস্থ্যগত, অর্থগত, আইনি ও ধীরে ধীরে সামাজিক সুরক্ষাও দেওয়া সম্ভব।

১৩৩৪ সালে প্রবাসী পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যার এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, শুধু কলকাতার পতিতালয়ে ২০০০ নাবালিকা রয়েছে। কিন্তু তাদের উদ্ধার করে পুনর্বাসন দেবার কোনো সরকারি ব্যবস্থা নেই। যদিও কিছু কিছু আশ্রম তাদের জন্য রয়েছে। কিন্তু সে সকল ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত। এ বিষয়ে উক্ত পত্রিকা লিখেছে, ''আশ্রমে পালিতা ও শিক্ষিতা বালিকাদের ভবিষ্যৎ কি হইবে; তাহাও চিন্তনীয়। কেহ কেহ শিক্ষা পাইয়া অবিবাহিত থাকিয়া শিক্ষা, শুশ্রুষা, ডাক্তারী প্রভৃতি কাজ করিতে পারে বটে। কিন্তু নরনারী উভয়ের অধিকাংশের পক্ষে যাহা সাধারণ ব্যবস্থা-বিবাহ-তারা ইহাদের জন্যও না করিতে পারিলে সামাজিক কল্যাণ সাধিত হইবে না। খৃষ্টিয়ান সমাজে ও মুসলমান সমাজে এরূপ বালিকার বিবাহে কোনো বাধা নেই। হিন্দু সমাজে বাধা রহিয়াছে। তাহারা কোন জাতের মেয়ে প্রথমত তাহা ঠিক করিতে হইবে। তাহা স্থির হইলে সেই জাতের পাত্র স্থির করিতে হইবে। কিন্তু এখন ভিন্ন ভিন্ন জাতের (Caste - এর) বরকন্যার বিবাহ বৈধ করিবার আইন হইয়াছে; তাহারা হিন্দু থাকিয়াই বিবাহ করিতে পারে। তাহা সুসাধ্য করিবার জন্য অবশ্য সামাজিক মত অনুকূল হওয়া দরকার। তাহা গঠিত করিবার জন্য সমাজনেতা ও সাংবাদিকগণ চেষ্টা করুন। যাঁহারা প্রাচীন সংস্কৃত নাটক মৃচ্ছকটিকের গল্পটিই জানেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, সমাজের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি কোন জাতিভূক্তা নহেন অথচ শিক্ষিতা ও স্বভাব গুণে শ্রদ্ধেয়া বসন্তসেনার সহিত শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণ চারুদত্তের বিবাহ হইয়াছিল। সুতরাং সেকালে, যখন হিন্দুরা এখনকার চেয়ে হিন্দুনামের অধিকতর যোগ্য ছিলেন, এরূপ বিবাহ হইতে পারিত।''

উপসংহার (Conclusion):

এ বক্তব্যের মূলকথা, হিন্দুধর্মের প্রবল যুগে যদি পতিতার সামাজিক বন্ধন সম্ভব তবে আজকের আধুনিক যুগে সেটা সম্ভব হবে না কেন। আসলে পতিতা সম্পর্কে সদর্থক পদক্ষেপ ও সামাজিক ও মানসিক দৃষ্টিকোণে পতিতাদের দেখার বিষয়টি সকলের বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে। শুধু সমাজ নয় ক্রমে ধর্মও পতিতাদের স্বীকৃতি দিয়েছিল। দেবদাসীরাই তার প্রমাণ। বর্তমানেও দুর্গাপুজোর সময় পতিতাদের প্রয়োজন হয়। তবুও প্রকাশ্যে তাদের বিষয়ে চিন্তা করতে, আলোচনা করতে এখনো শিক্ষিত সমাজ দ্বিধাগ্রস্ত। একবার সুইজারল্যান্ডে বসে স্বামীজী দক্ষিণেশ্বর থেকে এক পত্র পেলেন -- ''দক্ষিণেশ্বরের মহোৎসবে অনেক বেশ্যা যাইয়া থাকে এবং সেজন্য অনেক ভদ্রলোকের তথায় যাইবার ইচ্ছা কম হইতেছে।'' স্বামীজী তাঁর মতামত জানিয়ে চিঠি লিখলেন -- ''বেশ্যারা যদি দক্ষিণেশ্বরের মহাতীর্থে যাইতে না পারে তো কোথায় যাইবে? পাপীদের জন্য প্রভুর বিশেষ প্রকাশ, পুন্যবানের জন্য তত নহে। মেয়েপুরুষ ভেদাভেদ, জাতিভেদ, ধনভেদ, বিদ্যাভেদ ইত্যাদি নরকদ্বার রূপ বহুভেদ সংসারের মধ্যেই থাকুক। পবিত্র তীর্থস্থলে এইরূপ ভেদ যদি হয়, তাহা হইলে তীর্থ আর নরকে ভেদ কী? ... যারা ঠাকুর ঘরে গিয়াও ঐ বেশ্যা, ঐ নীচ জাতি, ঐ গরীব, ঐ ছোটলোক ভাবে, তাহাদের (অর্থাৎ যাহাদের তোমরা ভদ্রলোক বলো) সংখ্যা যতই কম হয়, ততই মঙ্গল।

যাহারা ভক্তের জাতি বা যোনি বা ব্যবসায় দেখে, তাহারা আমদের ঠাকুরকে কি বুঝিবে? প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যে, শত শত বেশ্যা আসুক তাঁর পায়ে মাথা নোয়াতে। বরং একজনও ভদ্রলোক না আসে নাই আসুক। বেশ্যা আসুক, মাতাল আসুক, চোর-ডাকাত আসুক -- তাঁর অবারিত দ্বার।'' (১২ আগস্ট, ১৮৯৬) কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'বারাঙ্গনা' কবিতায় যে 'মানুষের বাণী' শুনিয়েছেন, সেইটিও এ আলোচনার সার কথা হতে পারে।

কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা, কে দেয় থুতু
হয়ত তোমায় স্তন্য দিয়াছে সীতা-সম সতী মায়ে!
নাই হ'লে সতী তবু ত তোমরা মাতা-ভগিণীরই জাতি,
তোমাদেরই ছেলে আমাদেরই মত, তারা আমাদের জ্ঞাতি;
আমাদেরই কোনো বন্ধু স্বজন আত্মীয় বাবা কাকা
উহাদের পিতা, উহাদের মুখে মোদেরই চিহ্ন আঁকা।
আমাদেরই মত খ্যাতি যশ-মান তারাও লভিতে পারে,
তাদেরও সাধনা হানা দিতে পারে সদর স্বর্গ-দ্বারে!--
স্বর্গবেশ্যা ঘৃতাচী-পুত্র হ'ল মহাবীর দ্রোণ,
কুমারীর ছেলে বিশ্ব-পূজ্য কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন,
কানীন-পুত্র কর্ণ হইল দানবীর মহারথী,
স্বর্গ হইতে পতিতা গঙ্গা শিবেরে পেলেন পতি,
শান্তনু রাজা নিয়েছিল প্রেম পুনঃ সেই গঙ্গায়--
তাঁদেরি পুত্র অমর ভীষ্ম, কৃষ্ণ প্রণমে যাঁয়!
মুনি হ'ল সুনি সত্যকাম সে জারজ জবালা-শিশু,
বিস্ময়কর জন্ম যাঁহার--মহাপ্রেমিক সে যীশু!--
কেহ নহে হেথা পাপ-পঙ্কিল, কেহ সে ঘৃণ্য নহে,
ফুটিছে অযুত বিমল কমল কামনা-বালিয় নহে।
শোনো মানুষের বাণী,

জন্মের পর মানব জাতির থাকে না ক' কোন গ্লানি!

পাপ করিয়াছে বলিয়া কি নাই পুণ্যেরও অধিকার?

শত পাপ করি হয়নি ক্ষুন্ন দেবত্ব দেবতার!

সুপারিশ (Recommendation):

১) সমস্ত যৌনকর্মীকে সরকারী রেজিস্ট্রেশন করিয়ে তাদের পেশার বৈধতা দেবার জন্য একটি কার্ড করে দেওয়া প্রয়োজন। যাতে তারা পুলিশ বা দালালের হেনস্থার হাত থেকে বাঁচতে পারে। প্রতি বছর এই কার্ড নবীকরণের সময় ডাক্তারি পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হোক। সেই সঙ্গে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই পেশা গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। সেই সঙ্গে সে প্রাপ্ত বয়স্ক কিনা সেটাও বিচার করা দরকার।

২) ভোটাধিকারসহ নাগরিকদের জন্য যেসকল সরকারী ব্যবস্থা আছে সেগুলোর ব্যবস্থা করে যৌনকর্মীদের সমনাগরিক হিসাবে মর্যাদা দেওয়া হোক; যৌনকর্মীদের সাংবিধানিক অধিকার ও সম্মান রক্ষা যাতে সুনিশ্চিত হতে পারে।

৩) শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বিষয়ে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪) যৌনকর্মীদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন।

৫) যৌবন শেষে ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই পেশায় নিয়ে আসা যৌনকর্মীদের পুনর্বাসনের বিষয়ে সরকার চিন্তাভাবনা করুক।

৬) যৌনব্যবসা অন্য সব ব্যবসার মতোই বাজারি অর্থনীতির চাহিদা ও জোগানের নিয়মের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং এই ব্যবসাকে প্রত্যক্ষ করের আওতায় নিয়ে আসা প্রয়োজন। যাতে এই ব্যবসা বৈধ-অবৈধ এই দুটি ধারাকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করতে পারা যায়।

৭) যত্রতত্র ছড়িয়ে না রেখে দেহ ব্যবসা শপিংমলের মতো একটি নির্দিষ্ট ভবনে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পরিচালিত হওয়া দরকার।

৮) সর্বোপরি এই পেশা বিষয়ে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন দরকার।

গ্রন্থঋণ (Reference):

আনন্দবাজার পত্রিকা (৪ নভেম্বর, ২০১২)

ইসলাম, কাজী নজরুল (২০০২), সঞ্চিতা, ডি এম লাইব্রেরী, কলকাতা - ৭০০০০৬

ঘোষাল, শুক্লা (২০১১), সংকলন ও সম্পাদিত গ্রন্থ 'বঙ্গে নারী নির্যাতন ও নারীর উত্থান', আনন্দ পাবলিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৭০০০০৯।

চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাপদ (১৯৯৮), সংস্কৃত সাহিত্যে বারাঙ্গনা, সুবর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা ৭৩

দেবী, মানদা (১৯২৯), পতিতার আত্মচরিত, কুমারলি, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ

নারী যোজনা (২০১৫), ইন্ডিয়ান পাবলিকেশন, ডিভিশন যোজনা,

ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রচন্দ্র (১৯৬৯), ভারতের নারী, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ১২

ভট্টাচার্য, মৌ (২০১১), সম্পাদিত গ্রন্থ 'বেশ্যাপাড়ার পাঁচটি দুর্লভ সংগ্রহ', আনন্দ পাবলিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৭০০০০৯।

ভট্টাচার্য, সুকুমারী, ভারতের নারী, ন্যাশানাল বুক এজেন্সী, কলকাতা - ৭০০০৭৩

শংকর (২০১১), আমি বিবেকানন্দ বলছি, সাহিত্যম, কলকাতা - ৭০০০১৩

সরকার, পবিত্রকুমার (২০০১), সম্পাদিত গ্রন্থ 'ভারতের সমাজ ভারতের নারী', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা - ৭০০০১৩

সংবাদ প্রতিদিন (৯ এপ্রিল, ২০১৭)

সুর, অতুল (২০১৪), ভারতের বিবাহের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৭০০০০৯।